উমরের সাথে যখন দেখা হলো

বই	উমরের সাথে যখন দেখা হলো
মূল	ড. আদহাম আশ-শারকাবি
অনুবাদক	আমীমুল ইহসান
প্রচ্ছদ	কাজী যুবাইর মাহমুদ
প্রকাশক	রফিকুল ইসলাম

উমরের সাথে যখন দেখা হলো

আমিরুল মুমিনিন উমর ফারুকের
হৃদয়ছোঁয়া জীবনকাহিনি

ড. আদহাম আশ-শারকাবি

RUHAMA
PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন

উমরের সাথে যখন দেখা হলো

ড. আদহাম আশ-শারকাবি

গ্রন্থস্বত্ব © রুহামা পাবলিকেশন

প্রথম প্রকাশ
রমাজান ১৪৪৩ হিজরি / এপ্রিল ২০২২ ইসায়ি

অনলাইন পরিবেশক
ruhamashop.com
rokomari.com
wafilife.com

মূল্য : ৪৬৭ টাকা

RUHAMA PUBLICATION
রুহামা পাবলিকেশন
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা),
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৭৫১০৮২০০৮
ruhamapublication1@gmail.com
www.fb.com/ruhamapublicationBD
www.ruhamapublication.com

يَا عَمْرُو! مَتَى اِسْتَعْبَدْتُمُ النَّاسَ وَقَدْ وَلَدَتْهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ أَحْرَارًا

'আমর, তোমরা কবে থেকে লোকদের গোলাম বানিয়েছ; তাদেরকে
তো তাদের মায়েরা স্বাধীন মানুষ হিসেবে জন্ম দিয়েছিল।'

—আমিরুল মুমিনিন উমর বিন খাত্তাব ﵁

ড. আদহাম আশ-শারকাবির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ড. আদহাম আশ-শারকাবি ফিলিস্তিনি বংশোদ্ভূত একজন আরব সাহিত্যিক ও দায়ি। জন্ম ও বেড়ে ওঠা লেবাননের 'সুর' শহরে। পড়াশোনা করেছেন আরবি সাহিত্য নিয়ে। কাতারের 'আল-ওয়াতান' পত্রিকায় সাংবাদিকতার মাধ্যমে প্রবেশ করেন কর্মজীবনে।

২০১২ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম বই 'হাদিসুস সাবাহ।' অল্প সময়ের মধ্যে ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা পায় এই রচনাটি। তাঁর ঝরঝরে গদ্য, সাবলীল প্রকাশভঙ্গী ও চিত্তাকর্ষক উপস্থাপনা আরবের তরুণসমাজে বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। তারপর একে একে প্রকাশিত হয় : হাদিসুল মাসা, কিশ মালিক, আন শায়ইন ইসমুহু হুব্ব, ওয়া তিলকাল আইয়াম, মাআন নাবি, লির রিজালি ফাকত, ওয়া ইজাস সুহুফু নুশিরাত, ইনদা মা ইলতাকাইতু উমারাবনাল খাত্তাব ইত্যাদির মতো সাড়াজাগানো গ্রন্থ। নাবজ, নুতফাহ, লিয়াতমাইন্না কালবির মতো পাঠকপ্রিয় উপন্যাসগুলো তাঁকে পৌছে দেয় নতুন এক উচ্চতায়। শুরুর দিকে তিনি লিখতেন 'কিস বিন সায়িদাহ' ছদ্মনামে।

তাঁর লেখায় আপনি পাবেন তারুণ্যের সৌরভ, উদ্যম ও অনুপ্রেরণার অগণিত রসদ আর জীবনপথে চলার অমূল্য সব পাথেয়। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে তাঁর স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি আপনার হৃদয়কেও দোলা দিয়ে যাবে। পড়তে পড়তে মনে হবে ক্রমশ ভারী হয়ে আসছে আপনার জীবন-অভিজ্ঞতার ঝুলি।

ড. শারকাবি তাঁর অনুপম সাহিত্য-প্রতিভাকে নিয়োজিত করেছেন দাওয়াহর কাজে। কলমের নিখুঁত আঁচড়ে তিনি ফুটিয়ে তুলছেন ইমানের কথা, বিশ্বাসের কথা, আল্লাহর আনুগত্যের কথা। সময়ের দাবি ও চাহিদাকে সামনে রেখে তিনি আমাদের উপহার দিচ্ছেন একের পর এক মূল্যবান গ্রন্থ। আমরা তাঁর সুন্দর কর্মময় জীবন কামনা করি।

بسم الله الرحمن الرحيم

অনুবাদকের আরজ

আমিরুল মুমিনিন উমর বিন খাত্তাব ﷺ।

মানবজাতির ইতিহাসে এক অমর অজর নাম। নবিদের বাদ দিয়ে গোটা মানবজাতির দিকে হাত বাড়ালে তাঁর মতো ব্যক্তিত্ব দুয়েকজনের বেশি পাওয়া যাবে না। কল্পনাকেও হার মানায় তাঁর রোমাঞ্চকর জীবনকাহিনি। ইতিহাসের পথপরিক্রমায় তাঁকে নিয়ে রচিত হয়েছে অসংখ্য গ্রন্থ। একেকজন একেকভাবে চিত্রিত করার প্রয়াস পেয়েছে তাঁর বর্ণাঢ্য জীবনকে।

আপনার হাতের গ্রন্থটি তাঁকে নিয়েই রচিত। তবে অন্যসব জীবনীগ্রন্থের মতো এতে ভারিক্কি আলোচনা নেই। নেই রসকষহীন তথ্যসম্ভারের বিশাল সমাবেশ। লেখক আদহাম শারকাবির প্রাঞ্জল ও প্রাণবন্ত সংলাপধর্মী পরিবেশনায় এক অভিনব আঙ্গিকে এখানে উঠে এসেছে আমিরুল মুমিনিনের বিস্ময়কর জীবন। ভারী কোনো কিছুকে সহজ ও সাবলীলভাবে উপস্থাপন করতে অনেক লেখকই এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। যেসব পাঠক ভারী ইতিহাস পড়তে বিরক্তিবোধ করেন, তাদের জন্য এই ধরনের উপস্থাপনা খুবই উপযোগী। কারণ সংলাপের দ্রুতগামী আরামদায়ক জাহাজ কখন যে তাদের নিয়ে ইতিহাসের সাগর-মহাসাগর পাড়ি দিয়ে জ্ঞানের আলো-ঝলমলে বন্দরে নোঙর করবে, তারা নিজেরাই টের পাবেন না।

আমিরুল মুমিনিন উমর বিন খাত্তাবের জীবনী নিয়ে বাংলাভাষায়ও কিছু কাজ হয়েছে। তবে এই ধরনের কাজ বাংলা ভাষায় এই প্রথম। লেখক তার সৃজনশীলতা ও ভাষাদক্ষতার নিখুঁত সম্মিলন ঘটিয়েছেন এই বইটিতে। এক অভিনব পদ্ধতিতে শুরু হয়েছে বইটির আলোচনা। তারপর নদীর স্বচ্ছ পানির মতো বয়ে চলেছে সংলাপ। ইতিহাসের বিশুদ্ধ পাঠকে এভাবে সংলাপের ধাঁচে তুলে ধরা সত্যিই দক্ষ কলমের কাজ। শক্তিমান লেখক আদহাম শারকাবি সেটিই করে দেখিয়েছেন।

***

বইটির শুরু হয়েছে একটি নাটকীয় ঘটনার অবতারণার মাধ্যমে : আমিরুল মুমিনিন উমর বিন খাত্তাবের সঙ্গে সহসা দেখা হয়ে যায় এক জ্ঞানপিপাসু বিচক্ষণ যুবকের। সালাম বিনিময়ের পর হঠাৎ কীভাবে যেন আলোচনা শুরু হয়ে যায়। সংলাপ একটু

এগুতেই চলে আসে তাঁর ইসলাম গ্রহণের বিস্ময়কর সেই কাহিনি। তারপর আসে তাঁর দুঃসাহসী হিজরতের গল্প, ইসলামের প্রথম ও দ্বিতীয় খলিফা নির্বাচনের জটিল লোমহর্ষক মুহূর্তগুলো; জীবন ও জগৎ নিয়ে ফারুকে আজমের ভাবনা, তাঁর বিশুদ্ধ দ্বীনি মেজাজ, তাঁর রায়ের প্রতি কুরআনের সমর্থন, তাঁর অন্তর্দৃষ্টি, শাসন ও রাজনীতি, প্রশাসনিক দক্ষতা, বিচারব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থাপনা, ঐতিহাসিক পদক্ষেপগুলো, তাঁর ইনসাফ ও তাকওয়া... কখনো চিত্তাকর্ষক গল্প, কখনো আলো-ঝলমলে ইতিহাস, কখনো দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গি এভাবে নানান চড়াই-উতরাই পেরিয়ে চলতে থাকে এক জীবন্ত প্রাণময় রোমাঞ্চকর আলোচনা। সব আলাপের শেষ আছে, মিলনের পর বিরহ আসে, একসময় ফুরিয়ে আসে সময়। ততক্ষণে আমিরুল মুমিনিনের জীবনের শেষ বাঁকে এসে পৌঁছয় সংলাপের তরি। অবতারণা হয় ব্যথাতুর এক দৃশ্যের... শেষের পৃষ্ঠাগুলো যখন পাঠক উলটাবেন, তার চোখে হয়তো টলমল করবে ক'ফোটা তপ্ত অশ্রু...

***

বইটির অনুবাদ যথাসম্ভব সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় করার চেষ্টা করা হয়েছে। বাংলাভাষী পাঠক সাধারণের কথা মাথায় রেখে সংগত কারণে কোথাও কোথাও ঈষৎ পরিমার্জনও করা হয়েছে। শুরু-শেষ সংলাপধর্মী এই বইয়ে কোথাও কোনো শিরোনাম ছিল না। পাঠকদের সুবিধার্থে আমরা শিরোনাম যুক্ত করে শুরুতে একটি নির্ঘণ্টও এঁটে দিয়েছি। আশা করি, এই মেহনতটুকু পাঠকদের কাজে আসবে।

আমরা আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি, বইটিকে সুন্দর ও নিখুঁত করে তুলতে। তবুও মানুষ হিসেবে আমরা কেউ ভুলের উর্ধ্বে নই। বইটি পাঠের সময় বিজ্ঞ পাঠকগণ যদি কোনো ভুলত্রুটি সম্পর্কে অবগত হন, তাহলে আমাদের জানিয়ে বাধিত করবেন। আমরা পরবর্তী সংস্করণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করব ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে দুআ করি, আল্লাহ তাআলা যেন এই বইটিকে সবার জন্য উপকারী ও কল্যাণকর বানান এবং সংশ্লিষ্ট সবার অন্তরে ইখলাস ও নিষ্ঠা দান করেন।

আমীমুল ইহসান
২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ ইসায়ি

সূচিপত্র

সাক্ষাতের পূর্বে... ⁞ ১৫

সাক্ষাতের পর... ⁞ ১৭

সংলাপের শুরু ⁞ ২০

কুফরের আঁধার পেরিয়ে ⁞ ২০

হিজরতের বন্ধুর পথে ⁞ ৩৭

সিদ্দিক বনাম ফারুক ⁞ ৪২

বনু সায়িদার মিলনায়তনে ⁞ ৫২

খলিফার আসনে ফারুকে আজম ⁞ ৫৬

প্রথম ভাষণ ⁞ ৬৫

ফারুকি মেজাজের সমর্থনে ওহি নাজিল ⁞ ৮৫

প্রথম ঘটনা ⁞ ৮৫

দ্বিতীয় ঘটনা ⁞ ৮৬

তৃতীয় ঘটনা ⁞ ৮৯

চতুর্থ ঘটনা ⁞ ৯১

পঞ্চম ঘটনা ⁞ ৯৫

ষষ্ঠ ঘটনা ⁞ ৯৭

সপ্তম ঘটনা ⁞ ১০২

মুসলিম নারীদের আত্মত্যাগ ও কুরবানি ⁞ ১০৭

কবি ও কবিতা ⁞ ১১২

নাজ্জাশি ও হারিসি বিন আজলানের ঘটনা ⁞ ১২৪

কবি হুতাইআর গল্প ⁞ ১২৭

দাম্পত্য জীবন ও পরিবার ⁞ ১৩৪
সন্তানসন্ততির অধিকার ⁞ ১৪৪
মুমিনের অন্তর্দৃষ্টি ⁞ ১৪৯
শাসন ও রাজনীতি ⁞ ১৬৫
ইসলামি রাষ্ট্রকে বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্তকরণ ⁞ ১৬৬
প্রশাসক নির্বাচন ⁞ ১৬৭
শাসনকার্যের তদারকি ⁞ ১৮৩
বিচারব্যবস্থা ⁞ ১৮৬
রাষ্ট্রব্যবস্থাপনা ⁞ ২১৮
প্রশাসকদের এখতিয়ার ⁞ ২২১
পাঁচটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ ⁞ ২২৬
খাইবার থেকে ইহুদিদের উচ্ছেদ ⁞ ২২৬
হিজরি সন প্রবর্তন ⁞ ১২৯
মাকামে ইবরাহিমের পুনর্স্থাপন ⁞ ২৩২
জামাআতে তারাবিহর সালাত ⁞ ২৩৬
মসজিদে নববির সম্প্রসারণ ⁞ ২৩৭
ইনসাফ ⁞ ২৪৩
বাইতুল মাকদিস বিজয় ⁞ ২৪৩
ইসলামের যুদ্ধনীতি ⁞ ২৪৭
জিম্মিদের অধিকার ⁞ ২৫৪
স্বজনপ্রীতিমুক্ত শাসন ⁞ ২৫৮
জিম্মিদের প্রতি দয়া ⁞ ২৭১
কাফিরমুক্ত প্রশাসন ⁞ ২৭৬
জাবালাহ বিন আইহামের ঘটনা ⁞ ২৭৯
পশুপাখির অধিকার ⁞ ২৮৫

অপূর্ব ইনসাফ ⁞ ২৮৮
আরও তিনটি গল্প ⁞ ২৯০
গভীর রাতে প্রজাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ ⁞ ২৯৫
উম্মু সুলাইতের গল্প ⁞ ৩১৪
বিধবা নারীর ঘটনা ⁞ ৩১৬
খলিফার নাতনি ⁞ ৩১৮
নুমান বিন নাদলার কাহিনি ⁞ ৩১৯
জনৈক কমান্ডারকে বরখাস্ত করার ঘটনা ⁞ ৩২১
জাকাত-বঞ্চিতা নারীর গল্প ⁞ ৩২২
রাষ্ট্রীয় সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ ⁞ ৩২৪
খলিফার জবাবদিহিতা ⁞ ৩২৮
হুরমুজানের গল্প ⁞ ৩৩০
সমালোচনা ও জবাব ⁞ ৩৩৮
অতিরিক্ত বেত্রাঘাতে সন্তানের মৃত্যু ⁞ ৩৩৯
বিনা অপরাধে দেশান্তর ⁞ ৩৪৩
মুজাহিদদের গনিমত থেকে বঞ্চিতকরণ ⁞ ৩৪৬
জাকাত বন্টনে কুরআনের বিধান লঙ্ঘন ⁞ ৩৫১
আহলে কিতাব নারীদের বিয়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা ⁞ ৩৫৫
ইসলামি পরিভাষার বিকৃতি ⁞ ৩৫৯
হাদিস সংকলনে নিষেধাজ্ঞা ⁞ ৩৬২
সুন্নাহকে কম গুরুত্ব প্রদান ⁞ ৩৬৪
ভুল নির্দেশনা প্রদান ⁞ ৩৬৫
রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর হুকুম লঙ্ঘন ⁞ ৩৬৮
বিদায়ের শেষ বাঁকে ⁞ ৩৭৩

সাক্ষাতের পূর্বে...

দূর থেকে কাউকে আসতে দেখা গেল। দীর্ঘকায়—উঁচু উঁচু খেজুর গাছের সাথে যেন তাঁর আত্মীয়তা আছে! শক্তপোক্ত—যেন শক্ত পাহাড়ের কোমর খোদাই করে তৈরি হয়েছে তাঁর অবয়ব!

বাম হাতে শোভা পাচ্ছে একটি লাঠি। তবে মাটির ওপর যেভাবে লাঠি রাখছেন, তা দেখে তোমার মনে হবে, তিনি লাঠিটা স্রেফ মাটিতে গেঁথেই চলেছেন—যেন পৃথিবীকে আপন কক্ষপথে স্থির রাখতেই তিনি এটি ব্যবহার করছেন! লাঠিতে ভর দেওয়ার প্রয়োজন যে তাঁর নেই, তা চলার ভঙ্গিতে স্পষ্ট।

মুখভর্তি ইহরামের পোশাকের মতো ঘন শুভ্র দাড়ি। গায়ের পুরোনো ও জীর্ণশীর্ণ পোশাক জানান দিচ্ছে তিনি একজন হতদরিদ্র বেদুইন। তবে দিবালোকের মতো তাঁর সুউজ্জ্বল মুখচ্ছবি এবং যুদ্ধপ্রান্তরের মতো প্রশস্ত আঁখিযুগল জানান দিচ্ছে 'তিনি সাধারণ কেউ নন!' সচরাচর যে ধরনের মানুষজনের সাথে আমাদের দেখা হয়, তিনি তাদের পর্যায়ে পড়েন না। বিরল কোনো ব্যক্তি অসাধারণ কোনো ব্যক্তিত্ব। তাঁর অবয়ব তাঁর আচরণ যেন নীরবতার ভাষায় জানিয়ে দিচ্ছে, লোকটির পেছনে কোনো কাহিনি আছে অথবা তিনি নিজেই একটি কাহিনি!

আসতে আসতে তিনি একদম আমার কাছে চলে এলেন। মুখে উচ্চারণ করতে চাইলাম, 'আপনি কে?' কিন্তু কিছু মানুষ আছেন, যাদের ভাবগাম্ভীর্যের কারণে তাদের সামনে কথা বের হয় না; বুকের ভেতর কোথাও আটকে থাকে! তিনি তেমনই একজন।

আমি হতভম্বের মতো বিস্ফারিত চোখ মেলে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। অজানা আতঙ্ক আর কৌতূহল যেন আমাকে হাতকড়া পরিয়ে দিয়েছে! খানিক পর তিনিই আমাকে বন্দিদশা থেকে মুক্তি দিলেন। বললেন, 'আস-সালামু আলাইকুম!'

ভরাট কণ্ঠস্বর তাঁর দৈহিক গড়নের মতোই শক্ত, তবে তাতে আছে মমতার ছোঁয়া—যেন মমতাময়ী মা নিজের অসুস্থ ছেলেকে ডাকছেন! আছে বিনম্রতার পরশ—যেন তা ফজরের সুললিত আজান!

কালবিলম্ব না করেই আমি উত্তর দিলাম, 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম!'

অতঃপর তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কোন জাতির লোক?'

— আরব।

— আরব তো অনেক আছে। তুমি কোন গোত্রের?

— আমি সেই গোত্রের, যারা রাজত্ব ও মান-ইজ্জত খুইয়ে এতিমের মতো নিকৃষ্ট লোকদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায়! আপনি কে?

— উমর বিন খাত্তাব!

— উম.. উম... উমর! রোম-পারস্যের ধ্বংসস্তূপের ওপর ইসলামের নিশান-ওড়ানো সাম্রাজ্যবাদের যম উমর?

— আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবি উমর। এ পরিচয়েই আমি সবচেয়ে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি।

এতক্ষণে অজ্ঞাত লোকটির পরিচয় স্পষ্ট হলো—তিনি উমর ؓ। এমন এক ব্যক্তি, যাঁর পেছনে কাহিনি আছে এমন নয়; বরং তিনি নিজেই একটি কাহিনি। এমন এক ব্যক্তি, যাঁর কাছ থেকে ইতিহাসের পাঠ গ্রহণ করা যায়। তবে তা এ জন্য নয় যে, তিনি ইতিহাস নিয়ে বিস্তর গবেষণা করেছেন; বরং এ জন্য যে, তিনি ইতিহাস নির্মাণ করেছেন। তবে যেহেতু আমি এখন উমর ؓ-এর সাথেই আছি, তাই সুবিস্তৃত ইতিহাস থেকে কেবল 'উমর অধ্যায়'-এর প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করেছি। এখন আমি কাহিনি শুনব সরাসরি কাহিনির মুখ থেকেই। মুজিজা সম্পর্কে জানব সরাসরি মুজিজার কাছ থেকে!

সাক্ষাতের পর...

ইসলাম মানুষকে কীভাবে বদলে দিয়েছে : কীভাবে তাদেরকে আল্লাহর নাফরমানির তমসাচ্ছন্ন সমুদ্র থেকে ইবাদত ও আনুগত্যের আলোকোজ্জ্বল বন্দরে এনে নামিয়ে দিয়েছে। কীভাবে একদল রাখালকে জালিম সম্রাজ্যের বিনাশ ঘটিয়ে ইনসাফভিত্তিক সভ্যতার প্রতিষ্ঠাকারী বানিয়েছে—উমর বিন খাত্তাব ﷺ তাঁর জীবন্ত প্রমাণ। যে লোক খেজুর নিয়ে মূর্তি বানিয়ে দিনে তার উপাসনা করতেন আর রাতের শেষভাগে ক্ষুধার জ্বালায় তা খেয়ে ফেলতেন, সে একই লোক 'বাইআতে রিদওয়ান'-এর গাছটি কেটে ফেললেন; যেন আল্লাহভিন্ন অন্য কারও প্রতি মানুষের হৃদয় অবনত না হয়! 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার অপরাধে কাউকে কঠিন শাস্তি দিতে যে মানুষের চোখের পলকও কাঁপত না, সে একই মানুষ ফুরাত নদীতে আল্লাহর ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বাহন থেকে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিলেন! তাঁর ভয় ছিল, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাঁকে প্রশ্ন করবেন : 'উমর, এই রাস্তা সংস্কার করনি কেন?!'

তাঁর বয়স তখন ২৬ বছর। নবি ﷺ দুআ করলেন, 'আল্লাহ, উমর বিন খাত্তাব অথবা আমর বিন হিশাম (আবু জাহেল)—এ দুইজনের মধ্য থেকে আপনার কাছে যে অধিক প্রিয়, তার মাধ্যমে ইসলামকে প্রভাবশালী করুন!' নবিজি ﷺ-এর এই দুআ প্রভাব বিস্তার করে নিল তাঁর হৃদয়ে।

এখান থেকেই ইতিহাসের নব অধ্যায়ের সূচনা। একটি দুআ তাঁকে বের করে আনল কুফুরির অন্ধকার প্রকোষ্ঠ থেকে ইসলামের আলো-ঝলমল মুক্ত বাতাসে। পাপের নোংরা জলাভূমি থেকে উদ্ধার করে পৌছিয়ে দিল শ্রেষ্ঠত্বের চূড়ায়। কূটচালের দারুন নাদওয়া থেকে টেনে এনে ছেড়ে দিল আসমানি ইলমের দারুল আরকামে।

যেহেতু মানুষ সুপ্ত প্রতিভার আধার এবং ইসলামপূর্ব জাহিলি যুগে যারা শ্রেষ্ঠ ইসলামেও তারা শ্রেষ্ঠ—যদি তারা দ্বীনি ইলম অর্জন করেন, তাই জাহিলি যুগের দুঃসাহসী উমরের মাঝে 'ফারুক' (হক-বাতিলের পার্থক্য নিরূপণকারী)হয়ে ওঠার উপাদান বিদ্যমান ছিল আগে থেকেই! অন্ধকার যুগ তাঁর সেই সুপ্ত প্রতিভার ওপর পর্দা ফেলে

দিয়েছিল। ইসলাম সেই পর্দাকে সরিয়ে তাঁর মেধা ও প্রতিভাকে জগতের সামনে উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। মানুষের অভ্যন্তরীণ প্রতিভা ও শ্রেষ্ঠত্বের মেরামত ও সংস্কার ইসলামের চেয়ে ভালো আর কেউই পারে না। ইসলাম মানুষের সহজাত বৈশিষ্ট্যকে দাবিয়ে রাখে না; বরং সুসভ্য করে। স্বভাবজাত গুণাবলি ধ্বংস করে না; বরং পালিশ করে আরও সুন্দর করে তোলে। তাই ইসলাম গ্রহণের পর উমর ﵁ মার্জিত ও সুসভ্য হয়ে এমন ব্যক্তিদের একজন হয়ে উঠেছেন, যাদের মতো মানুষ ইতিহাসে কেবল একবারই আসেন।

ইসলাম উমরের কুফরকে হত্যা করেছে; তাঁর ব্যক্তিত্বকে নয়। বরং তিনি যে এত দিন কুফরের লাগাম পরিহিত ছিলেন, নতুন জীবনদর্শন তাঁর গলা থেকে সে লাগাম খুলে দিয়েছে। এ ছাড়া তাঁর সহজাত বৈশিষ্ট্যে আর কোনো পরিবর্তন আসেনি। আগে বাতিলের ব্যাপারে যেমন কঠোর ও অনমনীয় ছিলেন, এখন হকের ব্যাপারে ঠিক ততটাই কঠোর ও অনমনীয়। আগে নিজেকে কাফির পরিচয় দিতে যেমন কারোরই পরোয়া করতেন না, ঠিক সেভাবেই এখন মুমিন পরিচয় দিতেও কোনো সংকোচ বা পরোয়া করেন না।

কারও মনে একটি যৌক্তিক প্রশ্ন দেখা দিতে পারে :

আমরা বলে এসেছি যে, মানুষের মাঝে উত্তম গুণাবলি প্রকৃতিগতভাবে বিদ্যমান থাকে, ইসলাম সেগুলোকে কেবল সুসভ্য, মার্জিত ও মসৃণ করে তোলে। তাই আমরা মেনে নিলাম যে, খলিফা উমরের মাঝে যে দৃঢ়তা ও প্রত্যয় ছিল, তা হুবহু জাহিলি যুগের উমরের দৃঢ়তা ও প্রত্যয়; যদিও তাঁর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ভিন্ন। কিন্তু তাঁর নম্রতাকে কীভাবে ব্যাখ্যা করব—যা ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর দৃঢ়তার ভারসাম্য ধরে রাখত!? যদি আগে থেকেই তাঁর মাঝে নম্রতা ও সহৃদয়তা থাকত, তাহলে যখন তিনি বনু আদির লোকদের ইসলাম গ্রহণ করার কারণে কঠোরভাবে শাস্তি দিচ্ছিলেন, এমনকি তাঁর নিকটাত্মীয় পর্যন্ত তাঁর শাস্তি থেকে রেহাই পাচ্ছিল না, তখন তাঁর এই নম্রতা কোথায় ছিল? যেহেতু সে দিন তাঁর মাঝে কোনোরূপ নম্রতা ও সহৃদয়তা দেখা যায়নি, তাই আমরা কীভাবে নম্রতাকে তাঁর সহজাত গুণ হিসেবে বিবেচনা করব!?

প্রশ্নটা যৌক্তিক, তবে বাস্তবসম্মত নয়। কেননা, প্রশ্নটি একটি ভুল ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত। তা হচ্ছে, দৃঢ়তা ও নম্রতাকে পরস্পর সাংঘর্ষিক মনে করা। অথচ এ দুই গুণের মাঝে কোনোরূপ সংঘর্ষ ও বৈপরীত্য নেই। নম্রতার সাথে যার সংঘর্ষ ও বৈপরীত্য আছে, তা হচ্ছে নিষ্ঠুরতা। উমর দৃঢ় ছিলেন, নিষ্ঠুর ছিলেন না। দৃঢ়তা আর

নিষ্ঠুরতা এক নয়। তবে অনেক ক্ষেত্রে দৃঢ়তা তার গায়ে নিষ্ঠুরতার পোশাক পরে, তাই অনেক মানুষ ভুল করে দুটিকে এক মনে করে বসে!

উমর স্বয়ং এখানে উপস্থিত আছেন আর আমরা সরাসরি তাঁর সাথে কথা না বলে তাঁর ব্যাপারে কথা বলে যাচ্ছি! যতক্ষণ তিনি এখানে আছেন, ততক্ষণ তাঁর ব্যাপারে কথা না বলে সরাসরি তাঁর সাথে কথা বলাই ঠিক হবে।

সংলাপের শুরু

কুফরের আঁধার পেরিয়ে

তাই আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম, 'আমিরুল মুমিনিন, আমি লায়লা বিনতে হানতামার সাথে আপনার সাক্ষাতের কথা শুনেছি। সে ব্যাপারে যদি একটু বিস্তারিত বলতেন!'

— বৎস, আমাদের সাক্ষাতের ঘটনাটি ঘটেছিল মক্কায়। তখন আমি মুশরিক ছিলাম আর উম্মে আব্দুল্লাহ বিনতে হানতামাকে আল্লাহ তাআলা ইসলামের দিশা দিয়েছিলেন। আমাদের মাঝে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। এদিকে রাসুল ﷺ কিছু মুসলিমকে হাবশায় (ইথিওপিয়ায়) হিজরত করার নির্দেশ দিলেন। উম্মে আব্দুল্লাহ হিজরত করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন এমন সময় আমি সেখানে উপস্থিত হলাম। বললাম, 'কোথাও চলে যাচ্ছেন নাকি, উম্মে আব্দুল্লাহ?' তিনি বললেন, 'হাঁ, চলে যাচ্ছি। আল্লাহর কসম, আপনারা আমাদের ওপর অত্যাচারের সীমা ছাড়িয়ে গেছেন; তাই আমরা আল্লাহর সুপ্রশস্ত পৃথিবীর কোনো নিরাপদ স্থানের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ছি।' তখন আমি বললাম, 'আল্লাহ আপনাদের সঙ্গী হোন!'

— আমিরুল মুমিনিন, আপনি কি জানেন, উম্মে আব্দুল্লাহ এ ঘটনাটি আমির বিন রাবিআর কাছে বর্ণনা করার সময় কী বলেছেন?

— না তো! কী বলেছেন?

— বলেছেন, 'আজ আমি উমরের মাঝে নম্রতা দেখেছি, যা ইতিপূর্বে কোনোদিন দেখিনি।'

উমরের চোখদুটি ভিজে গেল। কারণ, আমি তাঁকে তাঁর জীবনের এমন একটি অংশে নিয়ে গিয়েছি, পৃথিবীতে দ্বিতীয়বার ফিরে আসার সুযোগ পেলে যে অংশে তিনি কখনো ফিরতে চাইবেন না। তিনি জীবনের অন্ধকার অধ্যায়ের স্মৃতি স্মরণ করে অনুশোচনায়

ডুবে গেলেন। আমি পরবর্তী প্রশ্ন করে তাঁর সংবিৎ ফেরালাম। বললাম, 'আপনি কি জানেন, সে দিন উম্মে আব্দুল্লাহর কথার জবাবে আমির বিন রাবিআ কী বলেছেন?'

— কী বলেছেন তিনি উম্মে আব্দুল্লাহকে?

— বলেছেন, 'সম্ভবত তুমি উমরের ইসলাম গ্রহণের আশা করছ!'

উম্মে আব্দুল্লাহ বললেন, 'হাঁ, আমি তা-ই আশা করছি।' তখন আমির বললেন, 'খাত্তাবের গাধা ইসলাম গ্রহণ করতে পারে; কিন্তু উমর কোনোদিন ইসলাম গ্রহণ করবে না!'

এরপর আমি তাঁকে কোনো কথা বলতে না দিয়ে দ্রুত পরবর্তী প্রশ্ন করে বসলাম, 'আপনি তো তখন পাষাণহৃদয় কাফির ছিলেন, সেদিন এমন নম্রতা কোথা থেকে এসেছিল?'

— বৎস, বন্ধুত্বে যে মহৎ, ঝগড়াতেও সে মহৎ। ওই ব্যক্তির মাঝে কোনো কল্যাণ নেই, যে ঝগড়ার সময় অন্যায় করে। ওই ব্যক্তির মাঝেও কোনো কল্যাণ নেই, যে আত্মীয়দের সাথে নম্র আচরণ করে না।

— তাহলে আপনার আত্মীয়দের মধ্যে যারা মুসলিম হয়েছিলেন, তাদের সাথে শত্রুতা রাখতেন কেন?

— আমি তাদের বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি শত্রুতা পোষণ করতাম, ব্যক্তির প্রতি নয়। আমার অবস্থা আবু সুফিয়ানের মতো ছিল না—যার কাছে অনেক ধনসম্পদ ও মানমর্যাদা ছিল। ইসলামের দাওয়াত তাঁর মানমর্যাদার ওপর হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে এ ভয়ে তিনি ইসলামের বিরোধিতা করতেন। মামা আবু জাহেলের মতোও ছিল না আমার অবস্থা। তিনি ইসলামের বিরোধিতা করতেন, কারণ মর্যাদা বিষয়ে বনু আবদে মানাফের সাথে তাদের শীতলযুদ্ধ চলত। তিনি বলতেন, 'আমাদের এবং বনু আবদে মানাফের মাঝে মর্যাদার লড়াই চলমান। তারা গরিবদের খানা খাওয়ালে আমরাও খাওয়াই। তারা যুদ্ধের জন্য বাহন দান করলে আমরাও দান করি। তারা দান-খয়রাত করলে আমরাও করি। এমনকি আমাদের মর্যাদা সমানতালে চললেও আমরা বাজির ঘোড়ার মতো এক পক্ষ আরেক পক্ষকে ছাড়িয়ে যেতে চাই। এখন তারা বলছে যে, তাদের কাছে একজন নবি আছেন, যার কাছে আসমান থেকে ওহি আসে! আমরা তো আর নবি পাচ্ছি না। তাই আল্লাহর কসম, আমরা কক্ষনো তাঁর প্রতি ঈমান আনব না এবং তাঁকে নবি বলে বিশ্বাস করব না।'

আমি ওয়ালিদ বিন মুগিরার মতোও ছিলাম না, যিনি মানমর্যাদায় নিজেকে বড় মনে করতেন এবং মুহাম্মাদ ﷺ-কে ছোট মনে করতেন। মনে করতেন, মুহাম্মাদ ﷺ-এর চেয়ে তিনিই নবুওয়াতের অধিক হকদার! তাইতো তিনি বলেছেন, 'এ কুরআন কেন দুই জনপদের মধ্যকার মহান ব্যক্তির ওপর নাজিল করা হলো না?' অর্থাৎ তার মতে হয়তো তার ওপর অথবা তায়িফের আমর বিন উমাইর সাকাফির ওপর কুরআন নাজিল হওয়া অধিক যুক্তিসংগত ছিল! ইসলাম তার চেয়ে কম মর্যাদাসম্পন্ন। তার পছন্দমতো ব্যক্তির ওপর ওহি নাজিল না হওয়ার কারণে তিনি ইসলাম ও মুসলিমদের বিরোধিতা করতেন। আমার অবস্থান উতবা বিন রাবিআর মতোও ছিল না, যিনি বলেছিলেন, 'মুহাম্মাদ এবং আরবদের বিরোধ আরবদের ওপরই ছেড়ে দাও। যদি আরবরা তাঁকে মেরে ফেলে, তাহলে তো তাঁর থেকে আমরা মুক্তি পেয়ে গেলাম। আর যদি তিনি বিজয়ী হন, তাহলে একজন আরব হিসেবে তাঁর বিজয় আমাদেরই বিজয়, তাঁর সম্মান আমাদেরই সম্মান।' ইসলাম ও মুসলিমদের বিরোধিতায় আমার এমন কোনো স্বার্থ বা উদ্দেশ্য ছিল না। আমি শুধু সেই বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধিতা করেছিলাম, যা কুরাইশদের দুই ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছিল, তাদের ঐক্যে ফাটল ধরিয়েছিল, এমনকি পিতাকে এক দলে, ছেলেকে আরেক দলে এবং সহোদর দুই ভাইকে ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত করে দিয়েছিল!

— আমিরুল মুমিনিন, আপনার মতো বুদ্ধিমান লোক কী করে এত দিন বুঝতে পারেননি যে, দুই দলের মধ্যে কোন দল হকের ওপর আছে? আপনার মতো বুদ্ধিমান লোক কী করে খেজুর দিয়ে প্রতিমা বানিয়ে দিনের শুরুর ভাগে তার পূজা করতেন, তারপর রাতের শেষে তা খেয়ে ফেলতেন!?

— বৎস, আমাদের মাঝে বুদ্ধি ছিল, হিদায়াত ছিল না। যে বুদ্ধি হিদায়াতের পথ দেখায় না, তা পাগলা ঘোড়ার মতো—যে তার মালিককে টেনে নিয়ে যায়, মালিক তাকে নিয়ন্ত্রণ করে না। পরবর্তী সময়ে যে আমরা বিশ্বমানবতাকে নেতৃত্ব দিয়েছি, তা আমাদের বুদ্ধির জোরে নয়; বরং হিদায়াতের আলোর জোরে, যা আল্লাহ তাআলা আমাদের হৃদয়ে ঢেলে দিয়েছেন। আমাদের বুদ্ধি সে আলোয় আলোকিত হয়েছিল বিধায় আমরা শ্রেষ্ঠত্বের সিংহাসনে আরোহণ করতে পেরেছিলাম। শুধু আকল বা বুদ্ধি মানুষকে সঠিক পথ দেখাতে পারে না। তার জন্য হিদায়াতের নুর লাগে। আমি এমন অসংখ্য মানুষ দেখেছি, যারা উমরের চেয়ে অধিক বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ছিল; কিন্তু সে বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা তাদের জাহান্নাম থেকে রক্ষা করতে পারেনি। অপরদিকে, অসংখ্য সহজ-সরল ও সাদাসিধে মানুষের হৃদয়ে আল্লাহ

তাআলা ইমানের নুর ঢেলে দিয়েছেন। সে আলো তাদের এতটাই আলোকিত করে তুলেছে যে, তাদের আলোর কল্যাণে অসংখ্য পথহারা মানুষ পথের সন্ধান পেয়েছে!

উমর ﷺ যখন আমাকে হিদায়াতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে বলছেন, তখন আমার বুঝে আসলো, কেন কোনো মহাকাশচারী গরুর পূজা করতে পারে? কেন একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার মানুষের শরীরে সৃষ্টির সূক্ষ্মতা ও অলৌকিকতা দেখেও বিশ্বাস করে না যে, এমন দারুণ ও সূক্ষ্ম সৃষ্টির পেছনে নিশ্চয়ই সৃষ্টিকর্তার হাত আছে? আসলে ফারুক ﷺ যথাযথই বলেছেন—এটা বুদ্ধির সমস্যা নয়; হৃদয়ের সমস্যা। আল্লাহ তাআলা হৃদয়ে হিদায়াতের নুর ঢেলে না দিলে বুদ্ধি যতই তীক্ষ্ণ হোক, তা দিয়ে সঠিক পথের সন্ধান পাওয়া যায় না।

কথা যেহেতু হিদায়াত নিয়েই চলছে, তাই তাঁর হিদায়াত লাভের গল্পটি তাঁরই মুখ থেকে শোনার সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইলাম না। বললাম, 'আমিরুল মুমিনিন, আপনার ইসলাম গ্রহণের মুহূর্তটির গল্পটি আমাকে শোনাবেন?'

তিনি বললেন, 'তা ছিল এক সোনালি মুহূর্ত, যা সংঘটিত হওয়া আসমানে লিখা হয়েছিল আর দুনিয়াতে তা বাস্তবায়িত হয়েছে! আমি একজন জালিম প্রকৃতির লোক ছিলাম। কোনোদিন আমি ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নেব, তা মুসলিমরা আশা করত না। তবে রাসুল ﷺ একটি বিশেষ দুআর মাধ্যমে আমার মামলার ফাইলটি আসমানে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি দুআ করলেন, "আল্লাহ, উমর বিন খাত্তাব অথবা আমর বিন হিশাম—এ দুইজনের মধ্য থেকে আপনার কাছে যে অধিক প্রিয়, তার মাধ্যমে ইসলামকে প্রভাবশালী করুন!"

এ দুআ সম্পর্কে আমি সর্বপ্রথম অবগত হই আব্দুল্লাহ বিন মাসউদের মাধ্যমে, আমার ইসলাম গ্রহণের একদিন আগে। ঘটনাটি হলো, আবু জাহেল আব্দুল্লাহ বিন মাসউদকে মারতে মারতে মাটিতে ফেলে দিল। এতে ইবনে মাসউদের প্রতি আমার মনে দয়ার উদ্রেক হলে আমি হাত বাড়িয়ে তাঁকে তুলে নিই। তখন ইবনে মাসউদ আমাকে বললেন, "ওয়াল্লাহি, আপনিই দুজনের মধ্যে সর্বোত্তম! আমি মনে করি না যে, আপনার ব্যাপারে রাসুল ﷺ-এর দুআ বিফলে যাবে!" তবে সে সময় তাঁর কথাটি তেমন আমলে নিইনি আমি। পরে বুঝতে পেরেছি, এ দুআ কীভাবে আসমানে গৃহীত হয়েছিল!

সেদিন রাতে আমি নবি ﷺ-কে নিয়ে অনেক ভাবলাম। এই লোকটা তো পুরো কুরাইশের স্থিতি নষ্ট করে দিয়েছে! না, তাঁকে খতম করা ছাড়া উপায় নেই। যেই ভাবা সেই কাজ। আমি পরদিন তাঁকে হত্যা করার স্থির সংকল্প করলাম। ঠিক করলাম, প্রথমে আমি তাঁকে হত্যা করব, এরপর বনু হাশিমের কাছে গিয়ে আত্মসমর্পণ করব; যাতে রীতি অনুযায়ী তারা আমাকে হত্যা করে কিসাস নিতে পারে। আর এভাবেই মক্কা তার পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাবে।

পরদিন সকালে আমি তরবারি নিয়ে সংকল্প বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। রাস্তায় বনু জুহরার নাইম বিন আব্দুল্লাহ আদাবি নামক এক ব্যক্তির সাথে দেখা হলো। তখন তিনি মুসলিম ছিলেন, তবে নিজ গোত্রের ভয়ে তা গোপন রেখেছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, "কোথায় যাচ্ছেন উমর?"

– মুহাম্মাদকে হত্যা করতে যাচ্ছি—যে কুরাইশের মাঝে ফাটল ধরিয়েছে এবং কুরাইশের ধর্মবিশ্বাসকে ভুল বলে ঘোষণা করেছে!

– ওয়াল্লাহি, আপনি ধোঁকায় পতিত, হে উমর, আপনি যদি মুহাম্মাদকে হত্যা করেন, তাহলে বনু আবদে মানাফ আপনাকে জীবিত রাখবে না। তার চেয়ে আপনি আপনার পরিবারের সদস্যদের আগে ঠিক করুন!

– আমার পরিবার! স্পষ্ট করে বলুন!

– হাঁ, আপনার চাচাতো ভাই এবং আপনার বোন; আল্লাহর কসম, দুজনেই মুসলিম হয়ে গেছেন!

আমার অনিষ্ট থেকে রাসুল ﷺ-কে বাঁচানোর জন্য এই চুগলি করা ব্যতীত নাইমের আর কোনো উপায় ছিল না। তাঁদের ব্যাপারে না বললে রাসুল ﷺ-এর ক্ষতি, বললে তাঁদের ক্ষতি—নাইম তুলনামূলক সহজ ক্ষতিটা বেছে নিলেন রাসুল ﷺ-কে সুরক্ষিত রাখার জন্য। তখন না তিনি জানতেন, না আমি জানতাম যে, তিনি আমাকে এমন এক ঘরের পথ দেখিয়ে দিয়েছেন, যে ঘরে আমি যে অবস্থায় প্রবেশ করব, বের হব তার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থায়!

আমি রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে আমার বোন ফাতিমা ও তার স্বামী সাইদের বাড়ির দিকে ছুটে চললাম। দরজার কাছাকাছি গিয়ে শুনতে পেলাম, খাব্বাব বিন আরাত তাঁদের কুরআন পড়াচ্ছেন। আমি খুব জোরে দরজার কড়া নাড়ালাম এবং শক্ত কণ্ঠে বললাম, "দরজা খোল!!"

আমার রাগী কণ্ঠস্বর শুনে খাব্বাব দ্রুত লুকিয়ে পড়লেন। সাইদ দরজা খুলে দিলে আমি ভেতরে প্রবেশ করলাম এবং বললাম, "তোমাদের এখান থেকে একটা অস্পষ্ট আওয়াজ শুনতে পেয়েছি, সেটা কী?" ফাতিমা বলল, "কী আর হবে? আমি আর সাইদ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলছিলাম আর কি!"

তবে সে এ কথায় আমার মন ভুলাতে পারেনি। আমি রাগতস্বরে তাকে বললাম, "হে আত্মঘাতী, তুই কি বিধর্মী হয়ে গেছিস!?"

সে চুপ করে রইল। কোনো উত্তর দিল না। অতঃপর দুজনকে উদ্দেশ্য করে বললাম, "সম্ভবত তোমরা দুজনেই বাপদাদার ধর্ম ত্যাগ করেছ!?" তখন সাইদ বললেন, "উমর, যদি বুঝতে পারেন আপনি যে ধর্মে আছেন তা সত্য নয়—অন্য ধর্মই সত্য, তখন আপনি কী করবেন?"

তাঁর কথা শুনে রাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললাম আমি। নির্দয়ের মতো মারতে শুরু করলাম তাঁকে। ফাতিমা আমার হাত থেকে স্বামীকে বাঁচাতে এগিয়ে এল। আমি নিষ্ঠুরের মতো তাঁর কোমল চেহারায় আঘাত করে বসলাম! এতে বেচারির মুখ রক্তাক্ত হয়ে পড়ল!

মুখের ওপর থেকে কোমল হাতে রক্ত মুছতে মুছতে অশ্রুভেজা কণ্ঠে বোন আমাকে বলল, "ওহে খাত্তাবের ছেলে, সত্যিই আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। আপনার যা করার করুন, আমি কোনো পরোয়া করি না!" এ বলে সে তাঁর জায়গায় বসে পড়ল।

আমার সামনে কোমলমতি বোনের এমন সাহস এবং তাঁর চেহারায় রক্ত দেখে হৃদয় আমার নরম হয়ে উঠল। কিছু বলার আগেই আমার নজর পড়ল কুরআনের ওপর, যা তাঁরা আমার থেকে লুকিয়ে রেখেছিল। বললাম, "এটাই কি তোমরা পড়ছিলে আমার আসার সময়? দাও তো আমাকে!"

ফাতিমা বলল, "আপনি নাপাক, এ কিতাব কেবল পবিত্ররাই স্পর্শ করতে পারে। এটি ধরতে চাইলে আপনাকে গোসল করতে হবে!"

সেদিনই সর্বপ্রথম আমি শিরকের লাঞ্ছনা অনুভব করলাম। আমার আদরের বোন—যে কিনা কোনোদিন আমার কথার বাইরে যায়নি, সে-ই আজ আমাকে শক্তকণ্ঠে বলছে, "আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি, আপনার যা করার করুন!" এবং তাঁর কাছ থেকে একটি কিতাব চাইলে আমাকে সরাসরি না করে দিচ্ছে! এতে নিজেকে খুব ছোট, তুচ্ছ ও লাঞ্ছিত মনে হলো।

অতঃপর আমি উঠে গোসল করলাম এবং কুরআন নিয়ে পড়া শুরু করলাম।'

— আমিরুল মুমিনিন, তখন কোন সুরা পড়েছিলেন আপনি? কুরআন পড়ার সময় মনের ভেতর কেমন অনুভব করছিলেন? কী চলছিল আপনার মনের ভেতর তখন?

— তখন কুরআনের যে অংশটি আমি পাঠ করি, তা ছিল সুরা তহা। এ সুরাটি আমাকে সেখানে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল, যেখানে শুরু থেকে থাকা আমার উচিত ছিল। তবে প্রত্যেক বিষয়ের একটা নির্ধারিত সময় থাকে। আয়াতসমূহ আমার হৃদয়ে রেখাপাত করে চলল। আমি অনুভব করলাম, আয়াতগুলো কুঠার হয়ে আমার হৃদয়প্রাসাদে সযত্নে লালিত দেবতা হুবাল ও লাতকে গুঁড়িয়ে দিয়ে সেখানে তাওহিদের আজান উচ্চকিত করছে। আয়াতগুলো যেন আমার অন্ধকার হৃদয়ে ভোরের সূর্য হয়ে আত্মপ্রকাশ করছে। সুরা তহার মধ্যে ঠিক সে বিষয়গুলোর অবতারণা করা হয়েছে, যার প্রতি আমি মুখাপেক্ষী ছিলাম—মুহাম্মাদ ﷺ-কে সম্বোধন এবং মুসা ﷺ-এর কাহিনি। মুহাম্মাদ ﷺ-কে সম্বোধন করে তা-ই বলা হয়েছে, আকিদা-বিশ্বাসের দিক দিয়ে যার প্রতি আমি মুখাপেক্ষী ছিলাম। আর মুসা ﷺ-এর কাহিনি আমাকে জানাল, কীভাবে জীবনকে নতুনভাবে শুরু করতে হবে। আমি নিজেকে মুসা ﷺ-এর জায়গায় রেখে চিন্তা করলাম। মনে মনে বললাম, 'প্রত্যেক বস্তুর শুরু আছে, তাহলে আমি কেন শুরু করব না!?'

— জি, আপনার সেই সূচনার গল্পটিই আমি শুনতে চাইছি। বলুন, আয়াতসমূহ আপনার মাঝে কেমন ক্রিয়া করেছে এবং নবি ﷺ-এর সম্বোধন ও অন্য আরেকজন নবির গল্পে আপনি কীভাবে নিজেকে আবিষ্কার করলেন?

— (طه (١) مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى) 'তহা। তুমি কষ্ট পাওয়ার জন্য আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিনি।'[১] কী এক সান্ত্বনাদায়ক সম্বোধন! আরবি ভাষার অলংকার শাস্ত্রে আমার পারদর্শিতা আছে বিধায় সহজেই আমি বুঝতে পেরেছি যে, আয়াতের মর্ম হচ্ছে, 'তোমাকে স্বস্তি ও শান্তি দেওয়ার জন্যই আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি।' তখনই আমি বুঝতে পারলাম, রাসুল ﷺ ও তাঁর সঙ্গীদের আমরা যে কঠিন কঠিন অমানবিক শাস্তি দিই, এর ওপর ধৈর্যধারণ করার মতো অবিশ্বাস্য পর্যায়ের শক্তি তাঁরা কোথায় পায়। তাঁদের দৈহিকভাবে শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, এর মাধ্যমে আমরা তাঁদের

১. সুরা তহা, ২০ : ১-২।

অন্তরসমূহকে কুরাইশের ধর্মে ফিরে আসার জন্য প্রস্তুত করছি! কিন্তু এখন আমি বুঝতে পারলাম, তাঁদের অন্তরসমূহ আসমানের সাথে সংযুক্ত; সুতরাং যত নিষ্ঠুর শাস্তি দেওয়া হোক না কেন, তাঁরা নিজেদের বিশ্বাস থেকে চুল পরিমাণ নড়বে না। আমাদের ধারণা ছিল, তাঁদের শরীরকে কষ্ট দিয়ে আত্মার কর্তৃত্ব গ্রহণ করব; কিন্তু এখন আমার বোধোদয় হলো, যে নিজের আত্মা ও কলবের ওপর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করেছে, তার দেহের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা গেলেও তাকে নতজানু করা অসম্ভব। মুহাম্মাদ ﷺ ঠিক সে কাজটাই করেছেন। তিনি তাঁর অনুসারীদের আত্মা ও কলবসমূহ থেকে পরাধীনতার শৃঙ্খল খুলে নিয়েছেন। এমনকি তাঁরা দৈহিকভাবে কারও দাস হলেও মানসিকভাবে তাঁরা হয়ে উঠেছেন পরিপূর্ণ স্বাধীন! তাই কুরাইশের প্রভুদের এবং নেতৃস্থানীয় লোকদের হেয়প্রতিপন্ন করতে কোনো ভীতি বা জড়তা কাজ করে না তাঁদের মাঝে। এতদিন যে প্রশান্তি ও নিশ্চয়তা আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি, কুরআন আমাকে সে নিশ্চয়তার সন্ধান দিল। এতদিন যে আমরা আমাদেরই হাতে-গড়া প্রভুদের উপাসনা করতাম, তারা আমাদেরকে আমাদের সময় ও জীবনের দয়ার ওপর ছেড়ে দিয়েছিল। জীবন আমাদের সাথে তার ইচ্ছেমতো খেলা করত অথবা আমরা জীবনকে নিয়ে যেমন ইচ্ছা করতাম। এভাবে আমাদের জীবন হয়ে উঠেছিল অস্থির ও দুর্বিষহ। কিন্তু প্রকৃত প্রভু চান, আমাদের যেন কোনো কষ্ট না হয়। তিনি আমাদের হাতে-গড়া প্রভুদের মতো নন, তিনি সেই প্রভু, যিনি সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন। যিনি আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করেন, লালনপালন করেন। আমাদের জীবনে স্বস্তি ও আনন্দ ভরে দিতে চান। নিশ্চিন্ত জীবনযাপনের জন্য এমন প্রভুকে নির্বোধ ছাড়া আর কে ত্যাগ করতে পারে!?

— তারপর কী হলো, আমিরুল মুমিনিন?

— তারপরের আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, (إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ) 'বরং যে ভয় করে, তার উপদেশার্থেই (আমি কুরআন নাজিল করেছি)।'[২] এটি পড়ে আমার কাছে শিরকের রূঢ়তা ও ইমানের নম্রতা স্পষ্ট হলো। আমরা মুসলিমদের চাবুক দিয়ে পিটিয়ে তাঁদের পিঠের চামড়া তুলে ফেলি, মক্কার তপ্ত বালির ওপর শুয়ে দিয়ে চামড়া পুড়িয়ে ফেলি; কিন্তু তার বিপরীতে ইমান তাঁদের নির্দেশ দিচ্ছে না যে, তারা তোমাদের যেভাবে বেত্রাঘাত করছে, তোমরাও তা-ই করো; যেভাবে তারা তোমাদের তপ্ত বালুর ওপর ফেলে রাখছে, তোমরাও তাদেরকে

২. সুরা তহা, ২০ : ৩।

সেভাবে গরম বালুর ওপর ফেলে রাখো! বরং নির্দেশ দিচ্ছে, তাদের উপদেশ দাও, নরম ভাষায় কথা বলো! মূলত আল্লাহর এই উপদেশ আমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়াটাই ছিল নবিজি ﷺ-এর দায়িত্ব। কিন্তু আমরা মনে করতাম, তিনি সম্পদ কামানোর উদ্দেশ্যে এমনটা করছেন, তাই আমরা ধনসম্পদ দিয়ে তাঁকে দমানোর ব্যর্থ চেষ্টা করেছি। মনে করতাম, তিনি সুন্দরী মেয়ে লাভের জন্য এমন করছেন, তাই তাঁকে নিবৃত্ত করার জন্য আমাদের সবচেয়ে সুন্দরী নারীর সাথে বিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছি। আমাদের ধারণা ছিল, ধর্ম প্রচারের নামে তিনি মূলত রাজত্ব হাসিল করতে চাইছেন, তাই আমরা তাঁকে থামানোর জন্য আমাদের রাজা বানাতে চেয়েছি। আমাদের ধারণা ছিল, তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে নেতৃত্ব লাভ করা। তাই কাবার চাবিসমূহ তাঁর হাতে তুলে দিয়ে তাঁকে আমাদের নেতা স্বীকার করে নিতে চেয়েছি; যেন তিনি নতুন ধর্ম প্রচার করা থেকে ফিরে আসেন। কিন্তু কিছুতেই কোনো কাজ হয়নি। তিনি কার্য সম্পাদনে অটল ছিলেন। সুরা তহার এ আয়াতটি পড়ে আমি বুঝতে পারলাম, আমরা এতদিন যা করেছি, সব পণ্ডশ্রম ছিল। মুহাম্মাদ ﷺ-কে আমরা যেমনটা মনে করেছিলাম, তিনি তেমন নন। তাঁর এই দাওয়াহ ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য নয়; বরং যা তাঁকে পৌঁছিয়ে দিতে বলা হয়েছে, তিনি তা-ই পৌঁছিয়ে দিচ্ছেন এই যা! মানুষের অন্তরসমূহের চাবি তাঁর হাতে নয়, যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করার ক্ষমতাও তাঁর হাতে নেই। তিনি কেবল বার্তাবাহক। তবে সেই মহান সত্তার বার্তাবাহক, যাঁর হাতে আছে সকল অন্তর ও হিদায়াতের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ।

— তারপর?

— তারপর আল্লাহ বলেন, (تَنْزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى) 'যিনি পৃথিবী ও সমুচ্চ আকাশমণ্ডলী সৃষ্টি করেছেন, তাঁর নিকট হতে এটা অবতীর্ণ।'[৩] এটি পড়ে আমি শিরকের তুচ্ছতা অনুধাবন করলাম এবং বুঝতে পারলাম যে, এত দিন আমরা যে মাবুদসমূহের ইবাদত করে আসছি, তারা কতটা দুর্বল ও অক্ষম। আমরা বাজার থেকে গোলাম ক্রয় করে আনি, অতঃপর তাদেরকে 'মাবুদ' নির্মাণ করার দায়িত্ব দিই! মানে গোলামের হাতে প্রভুর সৃষ্টি! কিন্তু মুহাম্মাদ ও তাঁর অনুসারীরা যাঁকে মাবুদ মানে, তাঁর অবস্থা এমন নয়। তিনি সত্যিকার অর্থে মাবুদ। সকল কিছু তাঁরই সৃষ্টি। যে জমিনে আমরা বাস করি, আমাদের মাথার ওপর যে সুন্দর আকাশ আছে... সবই তাঁর অনুপম সৃষ্টি। অক্ষম ইলাহ ও শক্তিশালী

৩. সুরা তহা, ২০ : ৪।

ইলাহ, সৃষ্ট ইলাহ ও স্রষ্টা ইলাহ'র মাঝে যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য আছে, তা খুব ভালোভাবেই উপলব্ধি করলাম আমি। আমি বুঝতে পারলাম, আমাদের চারপাশে যত কিছু আছে, সবকিছু অস্তিত্বে আসার জন্য স্রষ্টার প্রয়োজন পড়ে, অনুরূপভাবে যে পাথরের টুকরোগুলোর আমরা পূজা করি, তারাও নিজে নিজে সৃষ্টি হতে অক্ষম। সুতরাং কীভাবে স্রষ্টাকে বাদ দিয়ে সৃষ্টের পূজা করা যায়!? প্রস্তুতকারীকে বাদ দিয়ে প্রস্তুতকৃতের ইবাদত করা যায়!? যে ইলাহ আমাদের সম্বোধন করে বলছেন যে, তিনি আমাদের কষ্ট দিতে চান না, তাঁকে বাদ দিয়ে বাকশক্তিহীন প্রভুদের কীভাবে ইবাদত করি!?

— তারপর কী, আমিরুল মুমিনিন?

— তারপর বলেছেন, (الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ) 'মহা দয়াময় আরশে সমুন্নত হয়েছেন।'[৪] এ আয়াত ঘোষণা দিচ্ছে যে, আল্লাহ আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন। এরপর 'মহাপ্রতাপশালী বা মহা শক্তিধর আরশে সমুন্নত হয়েছেন' এমনটা না বলে বলেছেন, 'মহা দয়াময় আরশে সমুন্নত হয়েছেন।' আসলেই তো! তিনিই তো মহা দয়ালু! শাস্তিদানের ক্ষমতা একমাত্র তাঁর হাতে থাকা সত্ত্বেও তিনি দয়ালু। রোগ দান করা ও শিফা দেওয়ার ক্ষমতা একমাত্র তাঁর হাতে থাকা সত্ত্বেও তিনি দয়াময়। মৃত্যু দেওয়ার ক্ষমতা একমাত্র তাঁর হাতে থাকা সত্ত্বেও তিনি করুণাময়। তাঁর আরশ অনেক দূরে, তবে তাঁর রহমত খুবই কাছে। এভাবে বলার মাধ্যমে তিনি আমাদের মন থেকে ভয়ভীতি দূর করে স্বস্তি আনতে চেয়েছেন। আমাদের মনে তাঁর প্রতি ভয়ের চেয়ে ভালোবাসাকে অধিক ক্রিয়াশীল করতে চেয়েছেন।

— তারপর?

— তারপর বলেন, (لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ) 'যা আছে আকাশমণ্ডলীতে, পৃথিবীতে, এ দুইয়ের অন্তর্বর্তী স্থানে ও ভূগর্ভে সব তাঁরই।'[৫] তোমাকে তাঁর কোনো প্রয়োজন নেই। তা সত্ত্বেও তিনি চান যে, তুমি তাঁর কাছে আসো! তাঁর সকল ফেরেশতা প্রতি নিশ্বাসে নিশ্বাসে তাঁর তাসবিহ পাঠ করে, তা সত্ত্বেও তিনি তোমার কাছ থেকে ইবাদত-বন্দেগি ও তাসবিহ কামনা করেন। কেন? নিজের জন্য? না, বরং তোমার জন্যই তোমাকে হিদায়াতের পথে চালাতে চান তিনি। তোমার কুফুরি তাঁর রাজত্বে অণু পরিমাণ ক্ষতি সাধন করতে

৪. সুরা তহা, ২০ : ৫।
৫. সুরা তহা, ২০ : ৬।

পারবে না। অনুরূপভাবে তোমার ইমান তাঁর একচ্ছত্র রাজত্বে অণু পরিমাণ বৃদ্ধি ঘটাতে পারবে না। তা সত্ত্বেও তিনি তোমার কাছে আনুগত্য চান! এতে তাঁর কোনো স্বার্থ নেই, শুধু তোমার কল্যাণের জন্যই তিনি তা চান! এর চেয়ে বড় উদারতা ও দয়া আর কী হতে পারে!?

— তারপর কী, আমিরুল মুমিনিন?

— তারপর (وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى) 'যদি তুমি উচ্চকণ্ঠে কথা বলো, তবে তিনি তো যা গুপ্ত ও অব্যক্ত সবই জানেন।'[৬] এই আয়াত পড়ে আমি বুঝতে পারলাম, এই ধর্ম কীভাবে এত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। মাত্র একজন ব্যক্তি হেরা গুহা থেকে নেমে এসে একটি দ্বীন প্রচার করা শুরু করলেন, আর তা শুকনো খড়কুটোয় যেভাবে আগুন ছড়িয়ে পড়ে, সেভাবে মক্কার সবখানে দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে! তাঁর একার পক্ষে তা কোনোভাবে সম্ভব ছিল না। নিশ্চয় তাঁর পেছনে এমন কোনো সত্তা আছেন, যিনি সব বিষয় সম্পর্কে অবগত। যিনি সবার হৃদয় দেখতে পান। যে হৃদয়ে তিনি কল্যাণ দেখতে পান, তাকেই তাঁর নবির নিকট নিয়ে আসেন। বংশীয় উচ্চতার এখানে কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। এ কারণেই বিলাল যে সত্যের সন্ধান পেয়েছেন, আবু জাহেল ও উতবারা তার সন্ধান পায়নি। কারণ এখানে ব্যাপারটি হৃদয়ের; দেহের নয়। রুহের; বংশের নয়। কুরাইশরা যে মানদণ্ড দিয়ে লোকদের পরিমাপ করে, আল্লাহ সে মানদণ্ড দিয়ে মাপেন না। তাঁর মানদণ্ড ভিন্ন। তারপর আমি বুঝতে পারলাম, আয়াতটি বাহ্যিক দৃষ্টিতে ধমকিমূলক মনে হলেও তা মূলত ধমকি নয়। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাঁর নবিকে এটি বলতে চাননি যে, তুমি আমাকে ভয় করো, কারণ আমি তোমার প্রকাশ্য দিক সম্পর্কে যেমন জানি, গোপনীয়তা সম্পর্কেও জানি। বরং আয়াতটি নিশ্চিন্ততা ও স্বস্তিজ্ঞাপক। এর মাধ্যমে তিনি বলতে চেয়েছেন, আমি প্রকাশ্যে ও গোপনে সর্বদা তোমার সাথেই আছি। তোমার কথাবার্তা যথার্থ রাখতে এবং তোমার হৃদয়কে সত্যের ওপর অবিচল রাখার জন্য আমি সর্বদা তোমার পাশেই আছি। মানুষজন তোমার কথা শুনলে আমি তোমার হিম্মত আরও বাড়িয়ে দিই। বিমুখতা প্রদর্শন করলে তোমার হৃদয়কে সান্ত্বনা দিই; যেন হতাশ হয়ে না পড়ে। তোমার অব্যক্ত ব্যথা-বেদনা ও হৃদয়ের অপ্রকাশিত কষ্ট সম্পর্কেও আমি জানি। সুতরাং চিন্তার কিছু নেই। আমিই সব ব্যথা-বেদনা ও কষ্ট দূর করে দেবো!

— তারপর কী, আমিরুল মুমিনিন?

---

৬. সুরা তহা, ২০ : ৭।